Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 358 – 365
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সৈয়দ শামসুল হকের নাট্যবিশ্ব : আখ্যান ও চরিত্রায়ন

ড. মাখন চন্দ্র রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : mcroy.ju@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Modern, Jaleswari, Poetic Drama, Liberation War, Hegemony, Western, Folk, Exprimental.

Abstract

In Bengali literature ambidexter artist Syed Shamsul Haque (1935-2016) uttered a prominent individual voice. Although he is fluent in various forms of literature including poetry, fiction, and essays, he is undisputed in writing poetic drama. He enriched the style of Bengali drama by composing modern plays in the theater of post-independence Bangladesh. He made folk culture and lifestyle the theme of his dramas under the shelter of the classical form of poetic drama. He has delighted readers and viewers by composing timeless dramas named *Payer Awaz Paa Jae* (1976), *Gananayak* (1976), *Ekhane Ekhon* (1981), *Nuraldiner Sarajivan* (1982), *Irsha* (1990), *Naarigan* (2007), *Uttarbangsho* (2008) etc. He is the first in the style of Bengali poetic drama, passing the prevailing trend of modern subjects and style from Rabindranath Tagore to Buddhadev Bose, to convey the complex reality of contemporary life in drama. Just as he has written successful poetic dramas using social and historical events as materials, he has also successfully presented the problems and complex thoughts of modern people in poetry. He has left his signature in Bengali drama by creating a skillful amalgamation of Eastern and Western theatrical ideas and creating an original, root-oriented theatrical language. Syed Shamsul Haque occupies a unique position in Bengali literature with the splendour, variety of writings, constant examination, society and individual-psychology and extraordinary thoughtfulness. Looking at the diversity of subjects, tradition and contemporary life consciousness, homeland and social thought, wonderful language and the physical technique of poetic drama, his poetic drama has created a unique genre in the history of Bengali drama. Appearing in the fifties, he has been active in progressive politics and social cultural movements for a long time and has been active in the arena of literature. Syed Shamsul Haque became associated with the film based on the drama. He displayed his talent in both Pakistan by producing films in Urdu language. He also wrote screenplays for movies like 'Abujh Mon', 'Mainamati', 'Madhur Milan' etc. Writing dialogues, naming above all the beliefs and culture of the common people of Bengali were the basis of his acting talent. He has gifted several timeless radio plays or television plays to the current generation of viewers and listeners. He has delighted readers

and viewers by creating dramas such as adaptations of William Shakespeare's *Macbeth* and *The Tempest*, Ariel Dafman's *Death and the Maiden*, and Rabindranath's *Chinnapatra*, *Banglar Mati Banglar Jal*. Syed Shamsul Haque not only spread light in the vast arena of Bengali theater literature, but was devoted to the role of creator to make the mind of Bengalis modern-scientific. A visionary of the fabled art-land called 'Jaleswari', this rare gifted dramatist is aware of his homeland and contemporary times.

Discussion

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) একজন বহুমাত্রিক প্রতিভাধর শিল্পী। সব্যসাচী অতিধায় অভিষিক্ত এই লেখক গল্পকার হিসেবে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করে আধুনিক বহুমাত্রিক সাহিত্য রচনায় অভিনব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধসহ সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে তাঁর স্বচ্ছন্দ্য প্রকাশ থাকলেও কাব্যনাট্য রচনায় তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলা নাট্যাঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে আধুনিক কাব্যনাটক রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা নাট্যচর্চার ধারায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। কাব্যনাটকের পূর্বকালীন আঙ্গিকের আশ্রয়ে তিনি এদেশীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে তাঁর নাট্যসমূহে প্রতিপাদ্য করেছেন। বিষয়ের অভিনবত্ব ও আঙ্গিক পরিচর্যার কৃতিত্বে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৫), *গণনায়ক* (১৯৭৬), *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২), *এখানে এখন* (১৯৮১), *ঈর্ষা* (১৯৯০), *নারীগণ* (২০০৭), *উত্তরবংশ* (২০০৮) প্রভৃতি তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বুদ্ধদেব বসু বাহিত আধুনিক বিষয় ও আঙ্গিকের প্রচল প্রবণতা অতিক্রম করে বাংলা কাব্যনাটকের ধারায় তিনিই প্রথম সমকালীন জীবনের জটিল বাস্তবতা রূপায়ণে নাটকে কাব্যের মূর্ছনা সঞ্চারিত করেছেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে তিনি যেমন সফল কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তেমনি আধুনিক কালের ব্যক্তি মানুষের অন্তর্গত সমস্যা-সংকট ও জটিল চিন্তা-চেতনাও কাব্যনাট্যাঙ্গিকে সাফল্যের সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যভাবনার সুনিপুণ মেলবন্ধন ও অকৃত্রিম এক শেকড় অভিমুখী নাট্যভাষা নির্মাণ করে বাংলা নাটকে তিনি স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সৈয়দ শামসুল হক বাংলা সাহিত্যের ভূগোলে 'জলেশ্বরী' নামের কল্পিত ভূখণ্ডের স্রষ্টা। লোকায়ত জীবনের মর্মমূলে অন্তর্নিহিত গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, হতাশা-যন্ত্রণা, সে-সঙ্গে তাঁদের টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে যে চেতনার বীজ লুক্কায়িত থাকে- তার প্রতি সুগভীর আস্থা থেকে জীবনের সার্বিক মুক্তির জন্য তিনি মানবতার জয়গানে মুখর থেকেছেন। সমকালীন জীবন প্রবাহকে নান্দনিক ভাবে রূপায়ণের প্রত্যয়ে তিনি পাশ্চাত্যের আধুনিক কাব্যনাট্য আন্দোলনের পুরোধা টি.এস.এলিয়টের সাহিত্য-ভাবনার দ্বারস্থ হয়েছেন। বিষয়ের বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য ও সমকালীন জীবনচেতনা, স্বদেশ ও সমাজচিন্তা, অপূর্ব ভাষাবিন্যাস ও কাব্যনাট্যের আঙ্গিক কৌশলের দিকে দৃষ্টি দিলে তাঁর কাব্যনাট্য বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটা স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছে। সমকাল-সচেতন শিল্পী সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাটকের নিরীক্ষাময় অঙ্গনে স্বদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে হয়ে উঠেছেন জননন্দিত শিল্পস্রষ্টা; 'জলেশ্বরীর জাদুকর' নাট্যব্যক্তিত্ব। সৈয়দ শামসুল হকের নাট্যপ্রতিভার বীজ উপ্ত হয়েছিল তাঁর শৈশব জীবনে উত্তরবঙ্গের ধরলা তীরবর্তী মফস্বল শহর কুড়িগ্রামে। লেখকের জবানীতে জানতে পাই –

> "নাটকের জন্য আমি তৈরি হয়ে উঠেছিলাম সেই ছোটবেলায় বালকের বিস্ময় নিয়ে লেখা ভোরের শেফালি ফুল আর দেয়ালে ঝোলানো বিবর্ণ তাজমহল বিষয়ে দু'টি পদ্য রচনারও বহু আগে-আগে এমনকি আমার এই আমিকে অনুভব করে উঠবার।... তৈরি হচ্ছিলাম নাটকের জন্য- শীত মৌসুমে বাবার সঙ্গে রাত জেগে ভ্রাম্যমান যাত্রাদলের পালা দেখে; প্রতি শীতে বরিশালের যাত্রাদল আসতো আমাদের ছোট্ট শহরে, বাবা ছিলেন যাত্রাপাগল মানুষ।"[১]

বাংলার মাটি-সংলগ্ন গণনায়কদের নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ ও লোকায়ত পরিবেশ রচনার মাধ্যমে পাঠক ও দর্শক নন্দিত বহু কাব্যনাটক উপহার দিয়েছেন তিনি। সৈয়দ শামসুল হকের সবচেয়ে সাফল্যের ক্ষেত্রটি সম্ভবত নাটক।

কবিতা, গল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ, তবে নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কাব্যনাটকে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর মূল অবলম্বন মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম চলাকালীন একটি অতিপরিচিত গল্পকে অবলম্বন করে তিনি এ নাটকের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। উনিশশো একাত্তর সালে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের জনপদ থেকে জেগে উঠেছিল সমবেত জনগণ। দক্ষিণ এশিয়ার স্মরণাতীত কালের দীর্ঘ, ভয়াবহ ও ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বাংলায়। বিশাল বাংলা জুড়ে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পদাতিক বাঙালির 'আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি'তে মুখরিত নাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*। নাটকের শুরুতেই সাধারণ জনতায় মঞ্চ ভরিয়ে তোলেন নাট্যকার –

"মানুষ আসতে আছে কালীপুর হাজীগঞ্জ থিকা
মানুষ আসতে আছে ফুলবাড়ী নাগেশ্বরী থিকা
মানুষ আসতে আছে যমুনার বানের লাহান
মানুষ আসতে আছে মহরমের ধূলার সমান।"[২]

যমুনার বান আর মহররমের মিছিলের ধূলায় উপমিত এ আওয়াজ এসেছে। স্ত্রী-সন্তান-বিধবাসহ ছিপি-ডিঙ্গি শালতি-ভেলায় লাঠি ভর দিয়ে ধূলি পায়ের চিত্রকল্প হয়ে নবজাগরণের অগমনবার্তা দিয়ে নাটকটি আরম্ভ হয়। পায়ের আওয়াজ পেয়ে বিভ্রান্ত গ্রামবাসী মাতব্বরের কাছে ব্যাখ্যা চায়। তারা পদশব্দের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন, তবে প্রজন্মান্তরে চলে আসা সামন্ত সমাজের সর্বশেষ প্রতিনিধি মাতব্বরের ইচ্ছার বাইরে তারা অসহায়। তাদের যৌথ অবচেতন মন জানে তাদের এই সামন্ত প্রতিনিধিকে শক্তি যোগাচ্ছে পীর সাহেব। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা সিদ্ধান্তহীন করে রাখে গ্রামবাসীকে। পায়ের আওয়াজ আর বাঁশ বাগানে দায়ের কোপের আওয়াজের মধ্যেই সামন্ততন্ত্রের সমাপ্তি আর লাল রক্ত সূর্য হয়ে দেখা মানুষের মুক্তির ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। ধর্মের সহযোগিতায় মাতব্বর শ্রেণি কীভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে এবং হানাদারের দোসর মাতব্বর কীভাবে নিজের কন্যাকে পাক-সেনাদের হাতে তুলে দেয়- এই বিভৎসতার চিত্র পাওয়া যায় এ নাটকে। পরিশেষে মাতব্বরের মেয়ে ক্ষোভে লজ্জায় বিষপানে প্রাণত্যাগ করে। লেখকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল সমস্ত ঘটনাকে গ্রামবাসীর মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক করে গড়ে তোলা। মুক্তিযুদ্ধের একটি অতিপরিচিত কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে চেয়েছেন। এ নাটকের নায়ক একক কোনো ব্যক্তি নন, আটষট্টি হাজার গ্রামবাসীর মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ।*পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর কাহিনি কেবল মুক্তিযুদ্ধের একটি গল্পমাত্র নয়, অনুভূতির তীব্রতায় এটি গ্রীক ট্র্যাজেডির সমতুল্য। নাটকের শেষ দিকে বিশ্বাসঘাতক মাতব্বরের কথা তার মেয়ের ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে এভাবে উচ্চারিত হয় –

"জিজ্ঞাসা করেন তারে, এক রাত্রি পরে
সাধের জামাই তার নাই ক্যান ঘরে?
রাত্রি দুইফরে
সে ক্যান ফালায়া গেল আমার জীবন
হঠাৎ খাটাশে খাওয়া হাসের মতন?"[৩]

কাহিনির সমাপ্তিতে মেয়ের বিষপানে আত্মহত্যা ও মাতব্বরের নিজের পাইকের ফলায় খুন হওয়ার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হয় অনেক আত্মত্যাগ, অগ্নিকাণ্ড, ধ্বংসযজ্ঞ, নারী সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। নাটকের সমাপ্তিতে 'পতাকার ওপর আলো থাকে'- এই আলোই বাংলার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতীক। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের ইতিহাসে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

> "দেশীয় পটভূমিতে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে রচিত এ নাটকে মহান মুক্তিসংগ্রামে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে নাট্যকার অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছেন।"[৪]

জনতার মুখের ভাষাকে যথার্থ কাব্যভাষার আঙ্গিকে প্রকাশ করার জন্য ভাষাকে পরিশীলিত করেছেন তিনি। উপভাষাকে তিনি বোধগম্য সরল-চলিত রূপে প্রকাশ করেছেন। তবে সেখানে গ্রাম্য মানুষের মুখের ভাষার সৌন্দর্য অক্ষুন্ন ও অবিকৃত

রেখেছেন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যমুনাপারের একটা গ্রামের অধিবাসী, ঐ গ্রমের মাতবর, পীর, যুবকদল-এসব চরিত্রের জীবনসংক্রান্ত সমস্যার আবর্তে নাটকটির কাঠামো গড়ে উঠেছে। নাটকের মূল কাঠামোকে সংহত রূপ দিতে এই স্বল্পসংখ্যক চরিত্র কখনো এককভাবে, আবার কখনো সম্মিলিতভাবে বিকশিত হয়েছে। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ নয়, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি ও অবস্থানই ছিল *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য। মুক্তিযুদ্ধের এ নাটক আমাদের মানসিক বোধ, নৈতিক প্রবনতা প্রভৃতির একটা আনুভূতিক দ্বন্দ্বকে জাগরিত করে।

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকে ইতিহাস ও শিল্পের যুগলবন্দি নির্মাণ করেছেন। "ইতিহাস ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নধর্মী সাহিত্যের ধারায় সৈয়দ শামসুল হকের *নূরলদীনের সারাজীবন* এক কালজয়ী নির্মাণ।"[৫] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিপন্ন বাস্তবতা থেকে উত্তরণের প্রত্যয়ে সৈয়দ শামসুল হক দুশো বছর পুরনো ইতিহাস থেকে তুলে এনেছেন রংপুরের কিংবদন্তি কৃষকনেতা নূরলদীনকে। ১৭৮৩ সালে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্তবাদ বিরোধী কৃষকনেতা নূরলদীনের সংগ্রামমুখর জীবন নিয়ে নাট্যকার গড়ে তুলেছিলেন স্মরণীয় এই নাটক। নূরলদীনের ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিসংগ্রামকে অসামান্য নৈপুণ্যে মিলিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত পয়ার ছন্দে বিন্যস্ত ব্যতিক্রমী এই কাব্যনাট্য বাংলা নাটকের ধারায় নবতর মাত্রা সঞ্চার করেছে। সৈয়দ শামসুল হক মনে করেন, ১৯৭১ সালে বাঙালির সমবেত জাগরণ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। বাঙালি জাতির মধ্যে অন্তর্নিহিত চিরায়ত সংগ্রামী চেতনাকে উপস্থাপনের জন্যই তিনি নূরলদীনের স্মরণ নিয়েছেন। এ কাব্যনাট্যের মধ্য দিয়ে সৈয়দ শামসুল হক দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথাই উচ্চারণ করেছেন –

> "যে জাতি অতীত স্মরণ করে না, সে জাতি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না। এই কাব্যনাট্যটি লিখে ফেলবার পর আমার আশা এই যে, এই মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন এমন যে সব গণনায়কদের আমরা ভুলে গিয়েছি তাদের আবার আমরা সমুখে দেখব এবং জানব যে আমাদের গণ-আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ও অনেক বড় মহিমার, সবার ওপরে। উনিশ শো একাত্তরের সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।"[৬]

নূরলদীনের আত্মা ও প্রেরণা তিনি সংগ্রহ করেছেন ইতিহাস থেকে, তাঁর ব্যক্তিত্ব জীবন ও মানসিক সংকট তিনি আবিষ্কার করে নিয়েছেন সম্ভবপরতার ক্ষেত্র থেকে। "ইতিহাস থেকে পেয়েছেন নূরলদীন, দয়াশীল ও গুডল্যাডকে, আর আব্বাস, আম্বিয়া, নিসবন, টমসন ও মরিসকে কল্পনায় নির্মাণ করেছেন।"[৭] বিপ্লবী নূরলদীন গরিব কৃষকের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নীল কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনা করেন। সাধারণ কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি পালন করেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। নূরলদীনের সংগ্রাম ও আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে রচিত হয় বাঙালির অধিকার আদায়ের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর আদর্শের স্পর্শে, জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ হয় সবাই। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকদের নিয়ে নূরলদীন যে বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, উত্তরকালে সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রামে তা সঞ্চার করেছে অতুলনীয় শক্তি। বাঙালি জাতিসত্তার সংগ্রামী চেতনা ও প্রতিরোধ বাসনাই যেন উদ্ভাসিত হয় নূরলদীনে শেষ সংলাপে –

> "ভাবিয়া কি দেখিবো, আব্বাস, যদি মরোঁ, কোনো দুঃখ নাই।
> হামার মরণ হয়, জীবনের মরণ যে নাই।
> এক এ নূরলদীন যদি চলি যায়,
> হাজার নূরলদীন আসিবে বাংলায়।
> এক এ নূরলদীন যদি মিশি যায়,
> অযুত নূরলদীন য্যান আসি যায়,
> নিযুত নূরলদীন য্যান বাঁচি রয়।"[৮]

প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের মন্ত্রে উজ্জীবিত এই নাটকে উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় উজ্জীবিত নিম্নবর্গের মানুষ স্বীয় অধিকার ঘোষণায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে; খুঁজে নিতে চায় তারা আপন অস্তিত্বের মৃত্তিকা। নূরলদীন যখন বলে "হারে কিসের বাহে

ডর? নেঙ্গুটিয়ার নেংটিও নাই, তবে কিসের ডর?”[৯] - তখন সর্বহারার শৃঙ্খলমোচনের বার্তাই পরিবেশিত হয়। নূরলদীনের মৃত্যুর পর নাটকের সর্বশেষ সংলাপ আব্বাসের মুখেই শুনতে পাই-

“ধৈর্য সবে- ধৈর্য ধরি করো আন্দোলন। লাগে না লাগুক, বাহে এক দুই তিন কিংবা কয়েক জীবন।”[১০]

এভাবেই ইতিহাসের সৃষ্টির চেয়ে শিল্পীর সৃষ্টি অমরত্ব লাভ করে। নাট্যকার *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকে আধিপত্যবাদী ক্ষমতাধর উচ্চবর্গ কোম্পানির শাসন-শোষণ, তৎসঙ্গে এদেশীয় জমিদার-মহাজন ও সুবিধাবাদীদের লাঞ্ছনা-অত্যাচারের পটভূমিকায় চিরবঞ্চিত নিম্নবর্গীয় কৃষক-প্রজার বিদ্রোহ ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের স্বরূপকে শৈল্পিকভাবে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মানুষের বিপর্যস্ত জীবনের চিত্র নিয়ে সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য *এখানে এখন* রচিত। এই কাব্যনাটকে নাট্যকার সমাজের দুটি বিশেষ শ্রেণিচরিত্র অঙ্কন করেছেন। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও চতুর মানুষ অন্য মানুষকে ব্যবহার করে। তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে তারা স্বার্থসর্বস্ব পশুতে পরিণত হয়ে যায়- *এখানে এখন* সমকালীন সেসব মানুষকে নিয়ে রচিত নাটক। সমকালে প্রতিটি মানুষ ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো না কোনো ভাবে- রাজনৈতিক কারণে কিংবা ভিন্ন স্বার্থের জন্য। ব্যবহৃত হতে হতে দেশও বিভক্ত হয়ে পড়ে একাধিক শ্রেণিতে। ‘ব্যবহর্তা’ ও ‘ব্যবহৃত’ দুটি শ্রেণি মিলিয়ে এই মানুষরাই পুরো জনগোষ্ঠী। নাটকে সাদা বেশধারী দুজনের সংলাপে জানা যায় –

“এখানে এখন
মানুষকে মানুষেরই মুখ চিনতে হয়
অন্য কোনো আলোকের দরকার হয়
মানুষকে মানুষেরই স্বর শুনতে হলে
কোনো এক প্রলয়ের দরকার হয়।”[১১]

স্বাধীনতার পর ভিন্নভাষী ব্যবহর্তাদের সরিয়ে নিজেরাই সেই জায়গায় বসে এদেশীয় কতিপয় মানুষ। ঠিকাদার, মুৎসুদ্দি, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম, একই গোত্রের নাসিরুদ্দিন, কালো পোশাকধারী অনামা, মিনতি, নিঃসন্তান সুলতানা এবং সাদা ও কালো বেশধারী দুজন বিবেক চরিত্রের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সমকালীন বাস্তবতাকে উদ্ভাসিত করেছেন নাট্যকার। দ্বিতীয় অঙ্কে চরিত্রের সংকট বিজড়িত কণ্ঠে দেশের পরিস্থিতি ফুঁটে ওঠে –

“জননী ও জন্মভূমি মরা গাঙে ভেলা ভাসিয়েছে,
অবেলায় সে ভেলায় তার কোটি ছেলে শুয়ে আছে
শিয়রে জননী জাগে, লাশ ভেসে যায় ইতিহাসে।”[১২]

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *কালঘর্ম* নামক উপন্যাস থেকে *এখানে এখন* কাব্যনাটকটি রচনা করেছেন। উপন্যাসের মৌল কাঠামো প্রভাব ফেলায় এ নাটকের আখ্যান নির্মাণ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তবে আধুনিক জীবনসমস্যা রূপায়ণে লেখক তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাব্যের দ্যোতনায় সমকালীন বাস্তবতায় দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, সীমাহীন সংকট মধ্যবিত্তের দর্পণে তুলে ধরছেন নাট্যকার। সৈয়দ শামসুল হকের সমাজ সচেতনতা ও সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে তীক্ষ্ণভাবে ধরা পড়েছে মানুষের অন্তর্জগতের রহস্য। সামাজিক মানুষের অবস্থানকে তিনি অভিনব এক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিদিনের সংঘাত, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং সামাজিক মানুষের ব্যক্তি উপলব্ধি নিয়ে রচিত এ কাব্যনাট্যে অকৃত্রিমভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে সমকালীন বাংলাদেশের সমাজচিত্র।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক এক ক্রান্তিকালের বাস্তবতা অবলম্বনে সৈয়দ শামসুল হক *গণনায়ক* কাব্যনাট্য রচনা করেন। এই কাব্যনাটকটি রচনার প্রারম্ভে ‘সবিনয় নিবেদনে’ ও প্রবণতা সম্পর্কে নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্য বলেছেন, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকটি লেখার পর *গণনায়ক* লেখা তাঁর জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তিনি এই রচনায় ‘রাজনৈতিক কিছু অভিজ্ঞতাকে’ পরীক্ষা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। *গণনায়ক* নাটকটি রচনায় সৈয়দ শামসুল হক শেক্সপিয়ারের নাটক *জুলিয়াস সিজারের* আশ্রয় নিয়েছেন। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রচিত

এই নাটকে লেখকের সমকালীন রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতীকি রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়। এ নাটকটিকে তিনি একটি রাজনৈতিক বিবেকের পালা বলতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক বাস্তবতা থেকে সদ্য মুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক জটিলতা ও তৎসঞ্জাত অভিজ্ঞতাকে এই নাটকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। নব্য পতাকালব্ধ রাষ্ট্রে জীবন ও রাজনীতি, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের ন্যায়বোধ, দেশদ্রোহীতা, অস্ত্র ও বিবেক- এসব জিজ্ঞাসার যথার্থ উদ্ভাসন ঘটেছে এই নাটকে। শেক্সপিয়ারের পঞ্চাঙ্ক রীতির নাটকের মতো *গণনায়কে*ও অঙ্ক পাঁচটি। তৃতীয় অঙ্কে নাটকীয় ক্রিয়ার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে রাষ্ট্রপতি হত্যার মধ্য দিয়ে। মির্জা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দার, সানাউল্লাহ, হুমায়ুন, দাউদ, আবু তাহের প্রভৃতি চরিত্র বাংলার ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ এক হত্যাকাণ্ডের সমকালীন চরিত্রগুলোকে মনে করিয়ে দেয়। রাষ্ট্রপতি ওসমানকে হত্যা করে সিকান্দার বলেছে মুক্তি, স্বাধীনতা, নৈরাজ্যের অবসান। বঙ্গবন্ধুর খুনিরা ঠিক এরকমই বলেছিল। তবে নাট্যকারের অভীষ্ট নিহিত আছে এই বাক্যে 'বাংলার মহত্তম সন্তান তিনি। বাংলাকে ভালোবেসেছেন। যা দিলেন, তিনি ছাড়া কে দিতে পারতেন?'[১৩] এভাবেই গণনায়ক নাটকটির ঘটনা, চরিত্র ও পরিস্থিতি সবকিছুই বঙ্গবন্ধু হত্যার ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নাটকটিতে রাজনীতির অন্দর-বাহির প্রকাশ লাভ করেছে। খুব কাছের মানুষ দ্বারা একজন রাষ্ট্রপতি কীভাবে নিহত হতে পারে তার বর্ণনা নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে এ নাটকে। আবার প্রতারণার ফলে ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে পালিয়ে বেড়াতে হয় তারও নজির আছে এখানে। একটি সংলাপ এরকম –

> "কাপুরুষ মৃত্যুর আগে বারবার মরে।
> বীর শুধু একবার। দীর্ঘ-এ জীবনে আমাকে অবাক করে দিয়ে যায় শুধু এই আবিষ্কার
> যে, মৃত্যুই নিশ্চিত তবু মৃত্যুকেই লোকে ভয় পায়
> ভয়াবহ ভাবে। মৃত্যু আসে, যখন সে আসে।"[১৪]

গণনায়ক কাব্যনাট্যকে এদেশীয় দর্শকদের মানসিকতার পরিপূরক করে তোলার জন্য দেশীয় পটভূমি ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। বাংলাদেশে **১৯৭৫** সালের পটপরিবর্তন ও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই নাটকের কাহিনি সঙ্গতিপূর্ণ। জুলিয়াস সিজারের চরিত্র ও পরিণাম গণনায়কের চরিত্রের সঙ্গে মিলে যায়। শেক্সপীয়রের *জুলিয়াস সিজার* অবলম্বনে রচিত *গণনায়ক* নাটকটি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও অনবদ্য।

সৈয়দ শামসুল হক নাটক রচনার ক্ষেত্রেই শুধু মুন্সিয়ানা দেখাননি, নাট্যচর্চায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। পাশ্চাত্য নাটকের ধারণা রপ্ত করে তিনি দেশীয় উপাদানে বাংলা নাট্যজগৎ দক্ষতার সঙ্গে সমৃদ্ধ করেছেন। শেক্সপিয়ারের *ওথেলো* নাটকের অনুপ্রেরণায় তিনি রচনা করেছেন মানবিক অনুভবের নাটক *ঈর্ষা*। এই কাব্যনাটকটি মানবিক বিষয় নিয়ে, মানবিক বোধের দ্বন্দ্ব- পারস্পরিক সংঘাত নিয়ে রচিত। কাব্যনাট্যে সৈয়দ শামসুল হক 'ঈর্ষা' নামক মানবিক প্রবৃত্তির নতুন মাত্রা আবিষ্কার করেছেন। *ঈর্ষার* সবিনয় নিবেদনে তিনি লিখেছেন –

> "আমার এমত মনে হয়, ঈর্ষা হয় এক বিস্ময়কর পরিস্থিতি; ঈর্ষা হয় একই সঙ্গে পাশবিক ও মানবিক একটি অনুভূতির সাধারণ নাম যার মূল ক্ষেত্র প্রেম কিংবা দেহ-সংসর্গ; হয় বিস্ময়কর মানবের বেলায়, এ কারণে যে, যে-মানুষ নিজের সীমা ও ভর সম্পর্কে সচেতন থেকে জীবনের অপর সকল প্রসঙ্গে আজীবন ঈর্ষাহীন, প্রেম না দেহ-সংসর্গের অনুষ্ঠানে সেই মানুষটিই নিজেকে হতে দেয় ঈর্ষাদষ্ট, পূর্বের আত্মচেতনা প্রয়োগ করতে সে হয় বিস্মৃত।"[১৫]

ঈর্ষা নাটকে কুশীলব মাত্র তিন জন- প্রৌঢ়, যুবতী ও যুবক। প্রৌঢ়ের তিনটি এবং যুবক ও যুবতীর দুটি করে সংলাপে অর্থাৎ মাত্র সাতটি দীর্ঘ সংলাপে নাটকটি রচিত হয়েছে। প্রৌঢ় চিত্রশিল্পী যুবতীর নগ্ন ছবি আঁকতে পছন্দ করে। কিন্তু যুবতী বিয়ে করে আর এক যুবক শিল্পীকে। প্রৌঢ় তাতে ক্রোধ প্রকাশ করলে যুবতী তাকে স্পষ্ট জানায় এটা তার ক্রোধ নয়, ঈর্ষা। এই পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বন্দ্বকে নাট্যদ্বন্দ্বে রূপ দিয়েছেন লেখক। ঈর্ষা নিয়ে প্রৌঢ়ের সংলাপের একটি অংশ নিম্নরূপ –

> "প্রেমিকের হৃদয় যদি পোড়ে তো একমাত্র ঈর্ষার আগুনেই পোড়ে,
> এতকাল জানতাম- ঈর্ষার যে পোড়েনি, প্রেম সে হৃদয় ধরেনি;

আজ আমি জেনেছি, ঈর্ষা এক ঠাণ্ডা নীল আগুন,
ঈর্ষা বস্তুতপক্ষে ক্রোধের বরফ- ঈর্ষায় একমাত্র প্রেমহীন পোড়ে।"[১৬]

যুবতী তার শিল্পী হয়ে ওঠা এবং প্রৌঢ়ের সামনে শরীর মেলে ধরার ঘটনা বর্ণনা করে চলে যায় এই বলে যে, একই সঙ্গে অনেককে ভালোবাসা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সে চারজনকে ভালোবাসর কথা বলে। জয়নুল ও কামরুলকে শুধু শিল্পী হিসেবে প্রৌঢ়কে শিল্পী ও মানুষ হিসেবে এবং যুবককে স্বামী হিসেবে। তার চলে যাবার পর প্রৌঢ়ের আত্মপোলব্ধি হয়। শেষ দৃশ্যে যুবতী এসে প্রৌঢ়ের কাধে হাত রাখলে দর্শকগণ অনুভবের এক বিস্ময়কর জগতে নিমগ্ন হয়। নিরীক্ষাধমী নাটক হিসেবে ঈর্ষা সৈয়দ শামসুল হকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

সৈয়দ শামসুল হকের অনবদ্য সৃষ্টি *নারীগণ* নারীজীবনের এক বেদনা ও বঞ্চনার মহাকাব্য। এই নাটকের হীরাঝিল প্রাসাদের জেনানা মহলের কথাগুলো পৃথিবীর নিপীড়িত নারীদের জন্য শাশ্বত বার্তা বহন করে। পুরুষের লোভের পাশাপাশি এ নাটকে নারীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জায়গাটিও স্পষ্ট হয়েছে। নবাব সিরাজদৌলার অন্দরমহলের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে নারীজগতেরই ইতিহাস বিবৃত করেছেন লেখক। নবাব সিরাজদৌলার মৃত্যুর পর বন্দিদশায় তার মা আমিনা বেগম, নানি শরিফুন্নেসা ও স্ত্রী লুৎফুন্নেসা ও তাদের দাস-দাসীরা নানা ভাবে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়। এক প্রহরীর সংলাপ এরকম –

"হাত ধরে খাঁচায় উঠাই!
খাবার হুকুম নাই- ছোঁয়াও নিষেধ?
ছুঁয়ে সুখ করি ভাই!"[১৭]

এই যে অসম্মান আর লাঞ্ছনা- বন্দিনীদের তা নীরবে সহ্য করতে হয়। বাইজি লুৎফার নাম উচ্চারণ করলে শরীফুন্নেসা উত্তেজিত হয়ে তাকে বেশ্যা বলে অপমানিত করে। এভাবে খুবই সরলভাবে প্রাসাদে অন্তরীণ ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীদের দ্বন্দ্বমুখর ভবিতব্যের বার্তা নিয়ে নাটকটি শিল্প সার্থকতায় উদ্ভাসিত হয়েছে। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকটি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে নবনির্মাণ করে সৈয়দ শামসুল হক, যার নাম দেন *চম্পাবতী*। বেদের মেয়ে চম্পার জীবনের বেদনাবিধুর কাহিনি এ নাটকের প্রতিপাদ্য। নাটকের শেষ দৃশ্যে সাপে কাটা হাত চুষে চুষে গয়া বাইদ্যাকে বাচিয়ে নিজে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে চম্পাবতী। সবশেষে গীত হয়-

"পঙ্খী উইড়া গেছে পঙ্খী আসমান দিয়া যায়। আসমান দিয়া গেছে পঙ্খী নীল নীলক্ষায়।"[১৮]

মরা ময়ূর কাব্যনাটকের প্রতিপাদ্য রাস্তায় পড়ে থাকা একটি মরা ময়ূর। মৃত এই ময়ূরকে কেন্দ্র করে নাটকটি এগোলেও এর কাহিনির মধ্যে রাজনীতি, সমাজ, দেশ- সবই এসে উপস্থিত হয় প্রসঙ্গক্রমে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ নাটকটি স্বল্পালোকে সমুজ্জ্বল। নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের আরেক কাব্যনাট্য *অপেক্ষমান* সমাজে প্রচলিত প্রেম-বিচ্ছেদ, রাজনীতি, ক্রোধ-ঈর্ষা প্রভৃতি দিক উন্মোচিত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক *উত্তরবংশ* কাব্যনাটকে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে একাত্তর পরবর্তী প্রজন্মের করণীয় নির্দেশ করেছেন।[১৯] এ নাটকে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে প্রধান তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। চরিত্র তিনটি হলো নাট্যকার, নেতা ও নাট্যকারের মেয়ে। নাটকের শেষ দিকে আন্দোলনের প্রশ্ন ওঠে এবং সেই একাত্তরের ঘটনার জন্য অপরাধীদের বিচারের দাবি জোরালো হয়। নাট্যকারে স্ত্রীকে ধরে নিয়ে মিলিটারিরা বাংকারে রেখে ধর্ষণ করে এবং তার স্ত্রী কখনো স্বাভাবিক হননি। একটি মেয়ের জন্ম দিলেও এর তিন বছর পর সে আত্মহত্যা করে। পরবর্তীতে অনেক দিন সত্য ঘটনা চাপা দিয়ে রাখলেও ঘটনাক্রমে মেয়েটি তার মায়ের আত্মহননের কারণ জানতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ক্ষমতাসীনরা নাট্যকারকে ইতিহাস লেখার জন্য তাগাদা দেয়। এরকম ইতিহাসের খণ্ডসত্যকে নানা আঙ্গিকে, নানা বর্ণনায় ও ব্যঞ্জনায় কাব্যনাট্যে তুলে আনেন নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক একটি অনন্য অধ্যায়; এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। পঞ্চাশের দশকের অপরাপর লেখকদের মতো তিনিও সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘজীবন প্রগতিশীল রাজনীতি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয় থেকে তিনি সাহিত্যের আঙ্গিনায় সদর্প পদচারণায় মুখর হয়ে

ওঠেন। নাটকের সূত্রেই সৈয়দ শামসুল হক চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ঊর্দু ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তিনি উভয় পাকিস্তানে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'অবুঝ মন', 'ময়নামতি', 'মধুর মিলন' প্রভৃতি সিনেমার চিত্রনাট্যও রচনা করেন তিনি। সংলাপ রচনা, নামকরণ সর্বোপরি বাঙালির সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আর সংস্কৃতিই তাঁর নাট্যপ্রতিভার ভিত্তি ছিল। বেশ কিছু কালজয়ী বেতার নাটক কিংবা টেলিভিশন নাটক তিনি বর্তমান প্রজন্মের দর্শক-শ্রোতাকে উপহার দিয়েছেন। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের *ম্যাকবেথ* ও *টেম্পেস্ট* নাটকের বিনির্মাণ, এরিয়েল ডফম্যানের *ডেথ অ্যান্ড দ্যা মেইডেন* অবলম্বনে রচিত *মুখোশ,* রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্র* অবলম্বনে রচিত *বাংলার মাটি বাংলার জল* প্রভৃতি নাটক রচনা করে তিনি পাঠক ও দর্শকনন্দিত হয়েছেন। তাঁর সকল সৃষ্টিকর্মের অন্তর জুড়েই রয়েছে এদেশের মাটি ও মানুষ- যার নাম দিয়েছেন তিনি জলেশ্বরী। বাংলার বুকে যতোবার দুঃখ-দারিদ্র্য, যতোবার স্বৈরশাসন, যতোবার মোল্লাতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে চরায় আটকে দেয় স্বপ্নসমুদয়, ততোবার জলেশ্বরীই বাঙালির অনিবার্য গন্তব্য হয়ে ওঠে; জীবনের সোচ্চার বিজয়মন্ত্র হয়ে। সমস্ত অন্যায় অসাম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে যিনি সবসময় উজ্জীবনের মন্ত্র 'জাগো বাহে, কোনটে সবাই' বলে ডাক দেন আমাদের- তিনি জলেশ্বরীর জাদুকর সৈয়দ শামসুল হক। বাংলা ভাষার একজন অনন্য ও অগ্রগণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি অনাগত কাল ধরে বাঙালি পাঠক ও দর্শকের 'পরাণের গহীন ভিতরে' চিরজাগরুক থাকবেন।

Reference :

১. হক, সৈয়দ শামসুল, *কাব্যনাটক সংগ্রহ,* বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৮
২. হক, সৈয়দ শামসুল, *কাব্যনাট্য সমগ্র,* চারুলিপি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৪. আহসান, মোস্তফা তরিকুল. *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৭৩
৫. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, 'নূরলদীন : ইতিহাস ও শিল্পের যুগলবন্দি', *জলেশ্বরীর জাদুকর,* (সম্পাদক: শামসুজ্জামান ও জাকির তালুকদার ও গিয়াস মজিদ), কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৫৪
৬. হক, সৈয়দ শামসুল, *কাব্যনাট্য সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
৭. বিশ্বাস, মিল্টন, 'কাব্যনাট্যের সৌকর্যে সৈয়দ শামসুল হক', *দৃষ্টি,* (সম্পাদক: বীরেন মুখার্জী), ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৪৯
৮. হক, সৈয়দ শামসুল, *কাব্যনাট্য সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮
১৯. হাসান, অনুপম, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয়-বৈচিত্র্য,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা. ২০১০, পৃ. ২০৩